যায়যায়দিন

তারিখ ... পৃষ্ঠা ...

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস: বন্ধ করতে হবে সরকারকেই

রণেশ মৈত্র

কয়েকদিন ধরে ঢাকা থেকে প্রকাশিত সংবাদসমূহ রীতিমতো গুরুত্বসহকারে যে সব দুঃখজনক সংবাদ প্রকাশ করেছে, সম্পাদকীয় উপসম্পাদকীয় ও মন্তব্য প্রতিবেদনসমূহ ছেপেছে তাতে রীতিমতো উদ্বিগ্ন বোধ করি। অতীতের বহু ভয়াবহ স্মৃতি, দুঃখবহ স্মৃতি, ভয়াবহ ও বেদনাদায়ক স্মৃতিও মনের কোণে ভেসে উঠলো। খবরটি নানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, হল বা ছাত্রাবাসসমূহে সংঘটিত (এই নিবন্ধ লেখা পর্যন্ত ২০.০১.০৯ তারিখ পর্যন্তও যার অবসান সূচিত হয়নি) সন্ত্রাসী, সশস্ত্র কার্যকলাপ সংক্রান্ত। আর আরো দুঃখজনক ব্যাপারটি হলো এসব সন্ত্রাসী ও ঔতিমূলক কার্যকলাপ পরিচালনা করে চলেছে জনপ্রিয় ভোটে বিপুলসংখ্যক আসনে এক ঐতিহাসিক বিজয় অর্জন করে ক্ষমতায় ফিরে আসা শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সর্বাপেক্ষা আলোচিত অঙ্গ সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। ঘটনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়িয়েও দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ছে। আওয়ামী লীগ পরিচালিত সরকার এতে বিব্রত ও অস্বস্তিকর এক পরিবেশে নিক্ষিপ্ত হয়ে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে গিয়ে আইন মেনে চলতে ও শিক্ষাঙ্গনসমূহকে সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যমুক্ত রাখতে এবং শিক্ষাঙ্গনে শান্তি বজায় রাখতে ও আইন শৃঙ্খলা সমুন্নত রাখতে নানা প্রকার হুমকি-ধামকি দিয়ে ছাত্রলীগকে বিরত করার চেষ্টা করছেন, সাংগঠনিক কার্যক্রম কোথাও কোথাও সাময়িকভাবে স্থগিত ঘোষণা করেছেন এবং দেশব্যাপী ওই ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে পরিস্থিতি এবং তা নিয়ন্ত্রণে করণীয় সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সারাদেশ থেকে ডেকে পাঠিয়েছেন বলেও খবর প্রকাশ হয়েছে। প্রকাশিত খবরগুলোতে বলা হয়েছে এতদসত্ত্বেও এ যাবতকাল পর্যন্ত পরিস্থিতির খুব একটা উন্নতি হয়নি- আতঙ্ক সর্বত্রই বিরাজমান। ওই সন্ত্রাসী ছাত্রনেতারা এসব নির্দেশ, হুমকি ও ব্যবস্থাদিতে তেমন একটা বিচলিত না হয়ে তাদের আরব্ধ কার্যকলাপ বেশ ঠাণ্ডা মাথায় চালিয়ে যাচ্ছে। শঙ্কাটা তাই অত্যন্ত স্বাভাবিক।

সদ্য বিপুল ভোটে নির্বাচিত জনপ্রিয় সরকারি দলের এই অঙ্গ সংগঠন এ জাতীয় ঘটনা ঘটাচ্ছে দেখে দেশের সাংবাদিক সমাজ ভয়ে চুপসে না গিয়ে যে অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে এসব ঘটনার খবর এবং তার ওপরে সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় এবং মন্তব্য প্রতিবেদন রোজই প্রকাশ করে চলেছেন- তার জন্য ওই সাংবাদিক সমাজ দেশে-বিদেশে অত্যন্ত প্রশংসিত হয়েছেন। আশা করি, আমাদের দেশের সংবাদপত্রসমূহ যথেষ্ট দায়িত্বশীল এবং সর্বদাই ন্যায়ের সংগ্রামে তাদের ভূমিকা উপযুক্তভাবেই তারা বহুকাল ধরে চালিয়ে যাচ্ছেন যেভাবে সেভাবেই তারা চালিয়ে যাবেন। এবং তার মাধ্যমে তারা তাদের দেশপ্রেম, সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের স্বাধীনতা বরাবরের মতোই সমুন্নত রাখতে যে প্রয়াসী হবেন অতীতের দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় সে বিশ্বাস আমার মনে অটুট।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, সরকার কি অসহায় সত্যই? যদি তা হয় তবে তা রীতিমতো উদ্বেগের বিষয়। আমি নিজে বা অন্য কেউই এমন উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো কারণই দেখি না ঈর্ষণীয় ভোটাধিক্যে তিন-চতুর্থাংশেরও বেশি আসনে অত্যন্ত গৌরবের সঙ্গে বিজয়ী হয়ে সদ্য ক্ষমতাসীন হওয়া বর্তমান সরকারের পক্ষে। সরকার তো নিজ দল ও তার অঙ্গ সংগঠনসমূহের হাজার হাজার নেতাকর্মীকে সারাদেশব্যাপী নির্বাচনোত্তর বিজয় মিছিল ও প্রতিহিংসামূলক আচরণ থেকে বিরত রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন মন্ত্রিসভা গঠনের দিন কয়েক আগ পর্যন্ত শুধু একটি নির্দেশ জারির মাধ্যমেই। কিন্তু আজ মন্ত্রিসভা গঠনের পর দু'সপ্তাহেরও বেশি অতিক্রান্ত হলো, সব মন্ত্রীই তার নিজ দাপ্তরিক দায়িত্বভার বুঝে পেয়ে দেশবাসীকে তাদের দায়িত্ব পালনে অত্যন্ত সৎ, নিষ্ঠাবান ও কর্তব্যপরায়ণ থাকার প্রতিশ্রুতির কথা স্বার্থহীন ভাষায় শোনালেন এবং খোদ প্রধানমন্ত্রীও দেশে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা, প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা বজায় রাখা আইনের যথাযথ এবং নিরপেক্ষ প্রয়োগ প্রভৃতি তার নির্বাচন-পূর্ব প্রতিশ্রুতির কথা প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরেও এ পর্যন্ত সাংবাদিক সম্মেলন করে বা পৃথক পৃথক সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে, সভা-সমাবেশের মাধ্যমে বহুবার দেশবাসীকে শোনালেন কিন্তু তারপরেও কেন পারছেন না? তবে কি পুনরায় আওয়ামী নেতৃত্ব দলীয় সংকীর্ণতা, দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রভৃতি চিরকালের আওয়ামী ব্যাধিতে আজো ভুগছেন? এ আশঙ্কা যদি সত্য হয় তবে তা দেশের জন্য যেমন অকল্যাণকর হবে জনগণ ও জাতির স্বার্থের পক্ষে তা যেমন অন্তরায় সৃষ্টি করবে তেমনি তা এক মহাবিপর্যয় অপ্রতিরোধ্যভাবে ডেকে আনবে আওয়ামী লীগ ও নবগঠিত সরকারের জন্যও। অতএব, সাধু সাবধান!

একটি বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিকে খবর বেরিয়েছে, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিগগিরই একটি নতুন আবাসিক হল নির্মিত হতে যাচ্ছে সাড়ে দশ কোটি টাকা ব্যয়ে। এই কাজ যদিও ঠিকাদাররাই সম্পাদন করবেন তাদের লাভের অংশের শেয়ার থেকে শুরু করে কাজ পাইয়ে দেয়া- টেন্ডার ফেলতে সাহায্য করা বা না ফেলতে বাধ্য করা ইত্যাদি কাজ শুরু করেছে সেখানকার ছাত্রলীগ নেতারা। ঠিক এই কাজগুলোই তো অবাধে ছাত্রলীগ করতে পেরেছিল ১৯৯৬-এ শেখ হাসিনা প্রথমবারের মতো যখন ক্ষমতায় এসেছিলেন। দীর্ঘ পাঁচ বছরব্যাপী এ জাতীয় কার্যকলাপ পরিচালনা করতে দেয়ার অমোঘ পরিণতিস্বরূপ মানুষ তা প্রতিরোধে চরম একটি সার্জিক্যাল অপারেশন করতে বাধ্য হয়েছিল ২০০১ সালে নির্বাচনের মাধ্যমে। ওই নির্বাচনের ফলাফলে দেখা গিয়েছিল বিএনপি-জামায়াত নেতৃত্বাধীন কুখ্যাত চারদলীয় জোট পুনরায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পেরেছিল এবং ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়াই তো শুধু নয়। ক্ষমতায় এসে তারা যে ভয়াবহ তাণ্ডব শুরু করেছিল গোটা দেশই তার সাক্ষী। আবারো কি তবে ওই ধরনের এক ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনতে দেয়া হবে ছাত্রলীগকে? ছাত্রলীগের নেতা হতে নাকি ছাত্রত্বের দরকার হয় না এমন খবরও কোনো কোনো সংবাদপত্র প্রকাশ করেছে সম্প্রতি। তবে কোন জাদু মন্ত্রবলে কোন ঐশী ক্ষমতাবলে ছাত্রলীগের নেতানেত্রী হয়ে যাওয়া যায় তা দেশবাসীর জানার অধিকার আছে। নিশ্চয়ই সে মন্ত্র কোনো বৈধ পথে পাওয়া যায় না। তার জন্য অবৈধ অস্ত্র এবং নেতা-নেত্রীদের প্রশ্রয়- এই দুটি বিষয়ের প্রয়োজন। দুটোই কি পাচ্ছে তারা? এ বিষয়টির দ্রুত তদন্ত করে খুঁটিয়ে বের করা হোক কারা অবৈধ অস্ত্র ধারণ করে এবং কাদের প্রশ্রয়ে ছাত্রলীগের নেতৃত্বে চলে এসেছে এবং এসে বিশ্ববিদ্যালয়ের হল দখল (চর দখলে কায়দায়) করছে- টেন্ডারবাজি করছে প্রভৃতি। নিরপেক্ষ এই তদন্ত কমিশনকে সাতদিনের মধ্যে তাদের তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হোক এবং অতঃপর সেই প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হোক।

বস্তুত এই ধারা যদি বিশ্ববিদ্যালয় বা অপরাপর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অব্যাহত গতিতে চালু থাকে তবে তা যে শিগগিরই ছোঁয়াচে রোগের মতো সারাদেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়বে এবং একপর্যায়ে এসে তা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর বাইরে এসে দেশময় ছড়িয়ে পড়বে। সর্বত্র শুরু হবে সন্ত্রাস, চুরি, ডাকাতি, অপহরণ, নারী ধর্ষণ, টেন্ডারবাজিসহ তাবৎ অপরাধমূলক কার্যকলাপ। তখন যতভাবেই চেষ্টা করা হোক না কেন কিছুতেই রোগ সারানো সম্ভব হবে না। পরিণতি দাঁড়াবে আরও ভয়াবহ। জনসমর্থন চলে যাবে শূন্যের কোঠায় এবং পাঁচ বছর পর জনগণ যে ভোটাধিকারের অস্ত্র দিয়ে প্রতিশোধ নেবেন তা কল্পনা করতেও শিউরে উঠতে হয়। এমন কি জনআক্রোশে পরিণত হতে পারে জনক্রোধ। এবং অন্তত পরবর্তী বিশ বছরেও ক্ষমতার ধারে কাছে পৌঁছানো যাবে না।

> আজ দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর তো আদৌ ছাত্র সংগঠন-নির্ভর হওয়ার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন সে কারণেই নেই- রাজনৈতিক দলের লেজুড় বা অঙ্গ সংগঠন হিসেবে কোন ছাত্র সংগঠনের অস্তিত্বের। তাই স্বাধীন সংগঠন হিসেবে ছাত্র সংগঠনগুলোর অস্তিত্ব তারা নিজেরা বজায় রাখতে চাইলে তারা রাখুক- কিন্তু কোন রাজনৈতিক দলই তাদের অঙ্গ-ছাত্র সংগঠন রাখতে পারবেন না। তখন সম্ভবত রাজনৈতিক দলগুলোও কোন ছাত্র সংগঠনের সাথেই কোন পক্ষপাতিত্বমূলক আদৌ কোন আচরণ করতে পারবেন না।

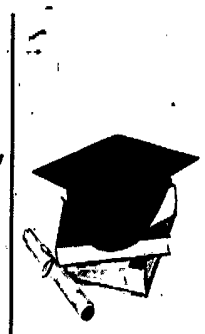

তাই প্রয়োজনে ছাত্র সংগঠন সম্পর্কে গভীরভাবে ভাবা দরকার- বিশেষত দলীয় অঙ্গ সংগঠন হিসেবে আর কোন ছাত্র সংগঠন থাকার আদৌ প্রয়োজন আছে কিনা সেই অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি গভীরভাবে নতুন সরকারকে ভাবতে অনুরোধ করি। বস্তুত ছাত্র সংগঠনের অস্তিত্ব বজায় রাখা না রাখা সম্পর্কে বাংলাদেশে আলোচনা করতে আমরা অনেকেই কুণ্ঠিত হই বা অস্বস্তি বোধ করি। কারণ আজ যারা বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলসমূহকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন বা পরিচালনা করছেন তাদের প্রায় সকলেই ছোটবেলায় কোন না কোন ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন ষাট বা সত্তরের দশকে অথবা তার আগেও যেমন বর্তমান অর্থমন্ত্রী। তাই তারা এবং আরও অনেকেই হয়তো মনে করেন যেহেতু আমাদের দেশের অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনগুলো ঐতিহ্যগতভাবে দেশের অগ্রগতিতে বিপুল অবদান অতীতে রেখেছে- তাই ছাত্র সংগঠনগুলো আগামীতেও রাখবে। এবং সে কারণে ছাত্র সংগঠনগুলোর অস্তিত্ব বজায় রাখা দেশের স্বার্থেই প্রয়োজন। এই নিবন্ধের লেখকও পূর্ব বাংলায় প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠন ও ছাত্র আন্দোলন থেকে রাজনীতি ও সাংবাদিকতায় আত্মনিয়োগ করেছেন। সুতরাং আমিও ছাত্র সংগঠন বিলুপ্ত করার পক্ষপাত নই। তবে ছাত্র সংগঠনের চরিত্র এবং ছাত্র আন্দোলনের ধারা নিয়ে নিশ্চিতভাবেই একটি ভিন্নমত পোষণ করি।

পাকিস্তান আমলে যখন প্রথম ১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এ দেশে ছাত্র সংগঠনগুলো পুষ্ট হতে থাকে এবং নতুন ছাত্র সংগঠনের জন্মও হতে থাকে- তখন এই দেশে রাজনৈতিক দলগুলোর অস্তিত্ব ছিল প্রায় শূন্যের কোঠায়। অতীতের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল-কংগ্রেস নিষ্প্রভ হতে হতে অবলুপ্ত অবস্থায় চলে গেল- গেল বিভাগ-পূর্ব অপরাপর ছোট বড় রাজনৈতিক দলও। সেই কারণে সৃষ্টি হলো সীমাহীন শূন্যতার। তাই তখনকার ছাত্র আন্দোলন ছাত্র সংগঠনগুলোকে শিক্ষাঙ্গনে বিরাজিত সমস্যাকেন্দ্রিক আন্দোলনের সঙ্গে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারেই জাতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনসমূহ গড়ে তুলেছেন- রাজনৈতিক দলের অভাবজনিত শূন্যতাকেও পূরণ করেছেন। অপরপক্ষে ধীরে ধীরে এ সকল ছাত্র আন্দোলন-সংগঠনের নেতাকর্মীরা বিভিন্ন রাজনৈতিক আদর্শভিত্তিক নানা দলও গড়ে তুলেন এবং সেই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই রাজনৈতিক দলগুলো পরিপুষ্টি লাভ করতে করতে বর্তমানের পরিণত রূপ গ্রহণ করেছে মূলত আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে তার চূড়ান্ত ও পরিপক্ব রূপ লাভ করে। আকার আকৃতিতেও দলগুলো যথেষ্ট বড় হয়ে ওঠে।

তাই আজ দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর তো আদৌ ছাত্র সংগঠন-নির্ভর হওয়ার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন সে কারণেই নেই- রাজনৈতিক দলের লেজুড় বা অঙ্গ সংগঠন হিসেবে কোন ছাত্র সংগঠনের অস্তিত্বের। তাই স্বাধীন সংগঠন হিসেবে ছাত্র সংগঠনগুলোর অস্তিত্ব তারা নিজেরা বজায় রাখতে চাইলে তারা রাখুক- কিন্তু কোন রাজনৈতিক দলই তাদের অঙ্গ-ছাত্র সংগঠন রাখতে পারবেন না। তখন সম্ভবত রাজনৈতিক দলগুলোও কোন ছাত্র সংগঠনের সাথেই কোন পক্ষপাতিত্বমূলক আদৌ কোন আচরণ করতে পারবেন না।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন স্বৈরাচারী এরশাদকে উচ্ছেদ সাধনের পর থেকে এ দেশের ছাত্র আন্দোলন জাতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনে কোন ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারেনি- আজও পারছে না- এমন কি সদ্য অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনেও ছাত্র সংগঠনগুলোর কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল বলে, আজ পর্যন্ত কাউকেই মন্তব্য করতে দেখিনি বা শুনিনি।

সর্বাপেক্ষা বেশি গুরুত্ব সহকারে সকলকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, প্রয়াত জেনারেল জিয়া তার জারিকৃত কুখ্যাত পিপিআর জারি করে রাজনৈতিক দলসমূহকে সরকারের কাছ থেকে রেজিস্ট্রেশন নিতে বাধ্য করেছিল এবং ঐ একই সালে ছাত্র, যুব, মহিলা, শ্রমিক, কৃষক প্রভৃতি সংগঠনগুলোকেও রাজনৈতিক কোন না কোন দলের অঙ্গ সংগঠনে পরিণত হতে তার সামরিক বাহিনী নিয়ন্ত্রিত সরকার বাধ্য করেছিল। উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই মহৎ কিছু ছিল না। সরকারসহ সকলকেই বিষয়টি ভাবতে অনুরোধ জানাই।

(সিডনি থেকে

রণেশ মৈত্র: রাজনীতিক, কলাম লেখক।
raneshmaitra@yahoo.com